Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 119 - 126
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' : জীবন ও জীবিকা বিষয়ক একটি পর্যালোচনা

শংকরদেব মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক
শরৎ সেন্টিনারী কলেজ, ধনিয়াখালী, হুগলী
Email ID: profsdm.1979@gmail.com

Received Date 16. 03. 2024
Selection Date 10. 04. 2024

Keyword
River centric, Picture of life, Materials, Familial crisis, Ever-changing, Reminiscence, Life flow.

Abstract
Ganga' is one of the distinguished river centric novels which deal with the hard realities of life and the livelihood of the fishermen community. The mythical and spiritual significances that are generally attributed to the river Ganga by the Hindus, are absent in the novel. The glory of the Ganga lies in its bounty to fulfill the biophysical necessity of the people irrespective of class and caste, living in a particular socio-economic environment. The novelist has been able to portray the eternal picture of life within a very short span of time. The stern life and occupation of the people, their longings and aspirations have been successfully presented. Living in isolation in human society is almost unthinkable. The desire for better living gives rise to social relations and interdependence. The 'Malo' people are to se 'll' their fish to the stockists; the retailers, in turn, buy from them and ultimately the fish reach the local consumers. The consumers earn the much needed money to purchase the materials by adopting various occupations. In the novel 'Ganga' we become familiar with many characters through the struggling life and familial crisis of Panchanan Malo alias Panchu of Dhaltita. Most of the part of the story has been described from the perspective of Panchu. His reminiscence of the past, moral conflict with his nephew Bilas, his worry for the future make the presentation of ever-changing life very subtle. The novel has ended with a reference to the philosophy of recklessly progressive life of Panchu. Although the story is limited to the time of five months, it manages to reflect on the account of life and time of generations. Hence, the presentation of fragments of life achieves the dignity of eternity within a limited plot which contributes to the universality of the novel. This paper investigates how the variety/diversity of life is reflected through the struggling life of a particular community, its social life and the broader life of variety of people along with their occupations in the novel 'Ganga'.

Discussion

কর্মভার মানুষকে নিয়তই হীনবল করে দিতে পারে। অনেক সময়, এর মূলে থাকে পারিবারিক পরিকাঠামোগত কারণ। মাত্রাতিরিক্ত শ্রমে আয় যেমন বাড়ে, জীবনের ঝুঁকিও তেমন বাড়ে। আপনজনদের একটু স্বাচ্ছন্দ্য দেবার বাসনায় স্বল্পবিত্ত বা বিত্তহীন মানুষ অতিরিক্ত শ্রমের জন্য অকাল মৃত্যুর কবলেও পতিত হয়। অনিয়ন্ত্রিত পরিবার বৃদ্ধি ও রোগ-ব্যাধিও জীবনযন্ত্রণা বাড়ায়। আয়ের অনিশ্চতায় অসহায় হয়ে সুদখোর মহাজনের করাল হাতে ধরা পড়তে হয়। তাই এককালে বংশপরম্পরায় ঋণের বোঝা গরিব মানুষের মেরুদণ্ড চিরকালের মতো দুর্বল করেছে। এই রকম একটি জীবন-কাঠামো সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসের উপজীব্য। গঙ্গার মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে প্রায় তিন-চার বছর ধরে ঔপন্যাসিক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপন্যাসটি ১৯৫৭ সালের শারদীয় সংখ্যা 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সমকালের প্রেক্ষাপটে মালো জীবন এই উপন্যাসে সুপ্রকাশিত হয়েছে।

গরিব জেলেদের জীবনের বারোমাসের সুখদুঃখের কথা অসামান্য দক্ষতায় ও আন্তরিকতার সঙ্গে লেখক 'গঙ্গা'য় বর্ণনা করেছেন। নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, মা-বাবা এদের অবিচ্ছিন্ন সংসারবন্ধন, জীবন ও জীবিকা, ঘরে-বাইরে বিরল এক যোগসূত্রে শোক-তাপ, অভাব-অনাহার, মায়া-মমতায় ভরপুর, স্বাভাবিক, সমগ্র জনপদ-জীবনের অন্তরালে সার্বিক প্রচেষ্টায় কোনক্রমে টিকে থাকা কত মর্মান্তিক লড়াইয়ের ফসল – তা এমন করে ভাষায় প্রকাশ করার কৃতিত্ব এককথায় অতুলনীয়। 'গঙ্গা' সেই রকমের একটি উপন্যাস, যেখানে বিশ্বময় সমগ্র প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের জীবিকার সার্বিক ও বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে; অন্তত ধরনে – এ কথা জোরের সাথে বলা যেতে পারে। ধলতিতা (বসিরহাট, অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা) গ্রামের পঞ্চানন মালোর পরিবার এ উপন্যাসে মালো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। পাঁচুর (পঞ্চাননের ডাকনাম) ঠাকুরদা, বাবা, তারা দুই ভাই (নিবারণ- পাঁচু), নিবারণের ছেলে বিলাস ও বিলাসের খুড়তুত ভাই (পাঁচুর ছেলে) সবাই বংশানুক্রমিক মাছমারা ('গঙ্গা' উপন্যাসে জেলেদের প্রতি লেখকের দেওয়া নাম)। প্রতি বছরই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ নিম্নগামী হয়েছে। নিবারণ মালো সাই নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেত। সাত বছর পূর্বে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। সেই থেকে পাঁচু নিজে কখনো সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়নি। টাকির ঠাকুর মশাই গণনা করে বলেছেন, পাঁচুদের বংশে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ। কিন্তু নিবারণের ছেলে বিলাস এই ধরণের বিধিনিষেধ মানতে চায় না। এর মধ্যেই সে অন্যের নৌকায় মজুর হয়ে দুবার সমুদ্রে মাছ ধরার কাজ করে এসেছে। সে সংস্কারবিহীন। এই কারণে কাকা-ভাইপোর মানসিক পার্থক্য দেখা যায়। নব প্রজন্মের সবাই আবার বিলাসের মতো প্রগতিশীল নয়। সে জেলে জীবনের সকল রকমের প্রতিবন্ধকতার প্রতিবাদী চরিত্র। জেলে জীবনের সরণী একমুখী সরলরেখার মতো নয়। মহাজনের লোভের করাল দৃষ্টি, খেয়ালী প্রকৃতির বিরূপতা মাছমারাদের স্বাভাবিক জীবনছন্দ বিঘ্নিত করে দেয়। বর্ষাকালে বিপুল আশা নিয়ে নিম্নবঙ্গের মাছমারারা গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরতে আসে। সারা বছরের জীবিকা নির্বাহের রসদ সংগ্রহের সেই হল সুবর্ণ সময়। মহাজনের নিকট থেকে সাময়িক খোরাকি চাল, কিছুটা ডাল, কিছু নগদ টাকা, নৌকা, জাল সুদের বিনিময়ে সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। যাদের নিজস্ব নৌকা, জাল আছে তারাও খোরাকি এবং নগদের জন্য মহাজনের কাছে ঋণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়। মূলত প্রাকৃতিক কারণে, প্রতিবছর মাছমারাদের প্রত্যাশা পূরণ হয় না। গঙ্গার বিপুল দানের স্মৃতিও তাদের সঞ্চয়ে রয়েছে। গঙ্গা বিমুখ করলে বিকল্প আয়ের উৎস সন্ধানে তারা তৎপর হয়ে ওঠে। টানের মরসুমে, অগ্রহায়ণ – ফাল্গুন পর্যন্ত, যাদের সামর্থ থাকে তারা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। গঙ্গার প্রতি অগাধ আস্থা রেখেই তারা প্রতিবছর মাছ ধরতে আসে। গঙ্গার দানে প্রত্যাশা পূরণ হলে অন্য কোথাও তারা যায় না। অন্য জীবিকার কথা তারা চিন্তা করে না। নানা কারণে পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়। তাছাড়া, মাছমারা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত একটি জীবিকা। বিগত পাঁচ বছরের অবস্থা লেখকের বর্ণনায়, -

> "গত মাঘ মাসে নৌকা বাঁধা পড়েছিল মহাজনের কাছে। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। আষাঢ়ের অর্ধেক পার হয়ে গেল। এতদিন বাদে দেনার উপরে আবার নতুন মুচলেকা দিয়ে নৌকা ছাড়ানো হল। আজ পাঁচ বছর ধরে, ফি বছর নৌকা বাঁধা পড়েছে। চক্রাকারে বাড়ছে দেনা।"[১]

গঙ্গার সদয় হওয়ার আশায় বহু মাছমারা প্রতি বছর বহু প্রতিকূলতা মাথায় করে আসে। মাছ ধরা না পড়লে, গঙ্গার পাড়ের মহাজনের কাছেও দেনা হয়ে যায়। গঙ্গার সামান্য দয়া হলে, তাতে মহাজনের কিছুটা দেনা শোধ হয় এবং জেলেদেরও কয়েকমাস চলে। অভাবের তাড়নায় পাঁচু প্রায় প্রতি বছরই চৈত্রমাসে গাজনের সন্ন্যাস নিয়েছে। চৈত্রে ও পৌষে মন্বন্তর

আসে, ফাল্গুনেও বিশেষ সুদিন আসে না। টানের সময়ে, শুকনো মরশুমে যারা সাই নিয়ে যায় কখনো কখনো তাদেরও দুর্দিন আসে, - প্রাকৃতিক কারণে মাছ ধরার অসুবিধা তৈরি হতে পারে, টাকার লোভে সাইয়ের উপর ডাকাত পড়তে পারে। লেখক জানাচ্ছেন, -

> "বড় শেয়ালের রাজ্যে বিনা খাজনায় মালিকানা করে এরা। তারা সুন্দরবনের ডাকাত।"[২]

প্রাকৃতিক কারণে, অমানবিক ডাকাতদের হাতে বা নিজেদের লোভের অসতর্কতায় সমুদ্রের বুকে কখনো কখনো প্রাণহানি হয়ে থাকে। তবুও প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই মাছমারারা সমুদ্রে যায়- মহাজনের ঋণ শোধ করা, ভাঙা ঘর সারানো, ঘরের লোকেদের ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়া মেটাবে এই আশায়। উপযুক্ত ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেবে। প্রত্যেকেরই এমন কত অন্তরের তাগিদ থাকে। সমুদ্রে যাওয়ার ঝুঁকির বর্ণনা লেখকের ভাষায়, -

> "যেখানে জীবনকে আড়াল করে মরণ সব সময় হাত বাড়িয়ে আছে। ঐ হাতের পাশ কাটিয়ে ফিরতে হবে।"[৩]

পাঁচুর সমুদ্রে মাছ ধরার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। তাই ভাইপো বিলাসকে ঝুঁকির মধ্যে যেতে দিতে চায় না। দেনার দায়ে সমুদ্রে মাছ ধরার পাটা জাল মহাজনের কাছে বাঁধা পড়েছে। কিছু দেনাও তাতে শোধ হয়েছে। এতে পাঁচু ঈশ্বরের কল্যাণ হাতের ছোঁয়া দেখতে পেয়েছে। সমুদ্রে মাছ ধরার জাল না থাকলে বিলাসের সমুদ্রে যাবার ইচ্ছাটা যদি ক্রমশ কমে – এটাই তার মনের বাসনা। তাদের ঘরে নিবারণের সমুদ্রে মাছ ধরার পানসা জাল আছে। একদিন হয়তো এ জালও মহাজনের কবলে বাঁধা পড়বে। পারিবারিক সম্পত্তি খোয়া গেলেও পরিবারের কোনো সদস্যের কোনো ধরনের ক্ষতি কল্পনা করতেও তার ভয় হয়। কিন্তু বিলাসের সমুদ্র-বাসনা এতই প্রবল যে, সে সব বাঁধা উপেক্ষা করে সমুদ্রে যাবেই। এই নিয়ে পাঁচুর সাথে বিলাসের সারাক্ষণ মতদ্বন্দ্ব লেগে আছে। বাইশ বছরের প্রাণোচ্ছল যুবক বিলাসের মধ্যে – বিলাসের ঠাকুরদা, পাঁচু, গঙ্গার পাড়ের মহিলা ফড়েনী দামিনী প্রায় প্রত্যেকেই কাজেকর্মে, স্বভাবে তার বাবা নিবারণের ছায়া দেখতে পায়। বেপরোয়া বিলাস অনেক সময় নিজের মর্জিমত চলে, বলে, কাজ করে। কয়েকটি নমুনা আমরা উল্লেখ করছি, - বিলাস সুরীনের বাবার মতো কাজ (চুরি) করতে পারবে না। গাঁয়ের মহাজন পালমশাই-এর সঙ্গে অনমনীয় হয়ে ঝগড়া করে আসে। নৈসর্গিক গণনা– পঞ্জিকার গণনা, টিকটিকি ডাকার লোকবিশ্বাস মানে না। মহাজনী নৌকা কেদমে পাঁচুর জাল ছিঁড়ে দিলে তার প্রতিবাদ করে। গঙ্গা পারের মহাজন ব্রজেন ঠাকুর মাছমারাদের অপমান করলে তার প্রতিবাদ করে। চন্দননগর এলাকার গঙ্গার পশ্চিমপারের মাছমারারা রসিকের নেতৃত্বে বাঁধাছাদি জাল পাতলে বিলাস তারও প্রতিবাদ করেছে। কারণ তাতে পূর্ব দিকের সব মাছমারাদের ক্ষতি হবে। ঠাণ্ডারামের নৌকা বেঘোরে জেটিতে আটকে গেলে বিলাস গিয়ে উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠাণ্ডারামের ভাই বিলাসের বন্ধু সহায়রাম বা সয়ারামকে নিজের নৌকায় স্থান দিয়েছে এবং যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। পরম মমতায় সে মৃত্যুপথযাত্রী কাকার সেবা করেছে। বিলাস তার সমস্ত কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অল্প বয়সেই নেতৃত্বের জায়গায় চলে এসেছে। তার এলাকার প্রতিবেশী গ্রামের মাছমারারা টানের মরসুমে এই অসম সাহসী নব যুবককে সামনে রেখে সমুদ্রযাত্রায় সামিল হয়।

বদলে যাওয়া সময়ের গতিবিধি ষাট বছরের পঞ্চাননের মনে দুশ্চিন্তা আনে। এতবড় সংসার (তেরো সদস্যের যৌথ পরিবার) দেখবে কে? মৃত্যু চিন্তা তাকে গ্রাস করছে। দুর্বল মুহূর্তে পাঁচুর মানসিকতা, -

> "আজও এক ফোঁটা জমি নেই। মাছমারারা সবাই নজর দিয়েছে ওই দিকে। অনেকে চাষ-আবাদ ধরেছে। মাছের কাজে নেই আর তারা। এখানে জীবন বড় সংশয়। বাঁচামরা সবই জলের হাতে। যা দেন সবই তার দয়া। ... চাষের কাজেও কমবেশী তাই। তবু লাঙল চালিয়ে, কাদা মাঠে নিজের হাতে চারা পুঁতে দেওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটু ভরসা আছে।"[৪]

আবার, -

> "একফোঁটা জমির মধ্যে কোথায় যেন একটি বাঁধা সুখের ঠিকানা লেখা রয়েছে।"[৫]

নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে পাঁচু জেনেছে, চাষের ক্ষেত্রেও প্রান্তিক কৃষকের বিশেষ সুবিধা নেই। পরিস্থিতি অনুসারে উভয় ক্ষেত্রেই সমান দুর্দশা আসতে পারে। জেলের নৌকা, জাল বাঁধা পড়ে; চাষির ঋণের শোধ হয় জমির ফসলে, কখনো কখনো জমির বিনিময়ে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 126
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধলতিতা গ্রামের একই পাড়ার অমৃতর বাবা কিছু চাষের জমি কিনতে পেরেছিল। মৎস্যজীবীর বিকল্প আয়ের ভাবনার ফলেই চাষের জমি করার সিদ্ধান্ত। সেই জমির আয়েই বর্তমানে অমৃতর সংসার চলে। আজ অমৃতর পরিবার চাষি পরিবার। হতে পারে, এই দৃষ্টান্তেই পাঁচু জমিজমা কেনার ভাবনা ভাবতে শুরু করেছে। টানা পাঁচ বছর ধরে বিলাসকে নিয়ে সে গঙ্গায় এসেছে। প্রতি বছরই কয়েক মাসের খোরাকি মিলেছে মাত্র। লেখকের বর্ণনায়, -

> "যা দিয়েছেন গঙ্গা, তাই নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু উপচে পড়েনি কোনোদিন। যে ওপচানোটুকু দিয়ে, একটু জমির বন্দোবস্ত করতে পারবে।"[৬]

ধলতিতার আরেকটি নৌকা এসেছে; ঠাণ্ডারাম ও তার ছোটো ভাই সহায়রাম বা সয়ারাম - গাঁয়ের মহাজন পালমশায়ের নিকট থেকে নিজেদের বাঁধা থাকা নৌকা ভাড়া নিয়ে গঙ্গায় মাছ ধরতে এসেছে। একই সঙ্গে তাদের বন্ধকি সুদ এবং নৌকার ভাড়া গুণতে হবে। গঙ্গায় মাছের আকালে দুশ্চিন্তায়, অনাহারে দুর্বলতায়, ক্ষণিকের অসাবধানতায়, তীব্র স্রোতের টান সামলাতে না পেরে নৌকা জেটিতে আটকে যায়; মাথায় আঘাত লেগে মাথা ফেটে যায় – সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডারামের মৃত্যু হয়। সে মহাজনী অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পালাতে চেয়েছিল। অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় ঠাণ্ডারাম মহাজনী অত্যাচার ও গঙ্গার নির্দয়তা থেকে সে চিরদিনের মতো মুক্তি পেয়েছে।

এক বৃহত্তর জনপদের মৎস্যজীবী মানুষ বর্ষাকালে গঙ্গায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। লেখকের বর্ণনায়, -

> "তাবত চব্বিশ পরগণা, হুগলী, নদীয়া, ওদিকের খুলনার পশ্চিম, যশোরের দক্ষিণপশ্চিমের মাছমারারা সব আসে গঙ্গায়। এখন দেশ ভাগাভাগি হয়েছে, পূরবীর হিন্দু মাছমারারা সবাই এখন সার করেছে গঙ্গা।"[৭]

প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই 'গঙ্গা' উপন্যাসে হিন্দু মাছমারাদের পাশাপাশি মুসলমান মাছমারাদের সাক্ষাৎও আমরা পাই – শাঁখচূড়ার সকল মিঞা, হাসনাবাদের নুরুল-আমানুল দুই ভাই। নুরুলের জাল জলের তলায় বালিতে চাপা পড়ে যায়। দুভাই মিলে বালি-চাপা পড়া জাল টেনে তুলতে গেলে জাল ছিঁড়ে যায়। জালে মাছ উঠছে না; তার উপর মাছ ধরার প্রধান উপকরণ খোয়া গিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে।

বাঁচার জন্য সারা বছরই মাছমারারা ভাগ্যান্বেষণে ব্যাপৃত থাকে। বিশেষত বর্ষার মরশুমে গঙ্গার আনুকূল্যই এই জেলেদের সবচেয়ে বড় মূলধন। অনেক আশা নিয়েই ভরা বর্ষার গঙ্গায় মাছমারারা মাছ ধরার প্রচেষ্টা চালায়। মাছ না পাওয়াকে বলা হয়েছে গঙ্গার নির্দয় হওয়া, -

> "মা গঙ্গার নির্দয় হওয়া যে কী বস্তু, সে জানে তারা, যাদের জীবনমরণ গঙ্গার গহ্বরে।"[৮]

গঙ্গায় ভাগ্য প্রসন্ন না হলে, সমুদ্রে যাওয়ার সামর্থ্য যারা রাখে, তাদের সমুদ্রে যাওয়ার ইচ্ছা তখন প্রবল হয়। আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তারা তখন ভাগ্যান্বেষণ করে। সমুদ্রেও অনেক প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করতে হয়। বর্ষার মরশুমে চার থেকে পাঁচ মাস আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক মাছমারা পুরুষ গঙ্গায় থকে। ইছামতী, ডানসা, বিদ্যাধরী, পিয়ালী, অন্যান্য গাঙ বা নদীতেও তারা মাছ ধরে। গঙ্গায় বহুদূর থেকে, বহুগুণ বেশী লোক মাছ ধরতে আসে। নদীতে যারা যেতে পারে না, তারা বিল বাওড়ে মাছ ধরে। সেক্ষেত্রে বিল-বাওড়ের যারা ইজারাদার তাদের কাছে খাজনা দিয়ে মাছ ধরতে হয়। আবার দেনার দায়ে ধরা মাছের বেশিরভাগটা চলে যায় মহাজনের হাতে। তাতে পরিবার পরিচালনার ব্যয়ভার কুলায় না। প্রবহমান দৈন্য মোচনের জন্যই গঙ্গায় অথবা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে হয়। টানের মরশুমে তিন থেকে চার মাস অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন - সমুদ্রে মাছ ধরার সময়। সমুদ্রে যারা যায়, পরিশ্রমের ফসল হিসাবে তাদের পাওয়া টাকা মহাজনের দেনা শোধ করতেই প্রায় শেষ হয়ে যায়। কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিজনদের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সাময়িক মিলনানন্দ লাভ হয়। চৈত্র মাসে বাওড়ে-বিলে-খালে অল্প কাদা-জলে যা পাওয়া যায় তাতে ঘরের লোকেদের একবেলা পেট ভরে না। অগত্যা মহাজনের কাছে ঋণ নিতে হয় - কখনো কখনো পুনরায় জাল-নৌকা-ভিটা বাঁধা পড়ে। চৈত্রে কোনো কোনো মাছমারা পুরুষ কাপড় ছুপিয়ে বাহ্যিক সন্ন্যাস নেয় এবং শিব পুজার জন্য ভিক্ষার আড়ালে খিদে মেটায়। কেউ কেউ সরাসরি ভিক্ষাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। বৈশাখে নতুন জল আসতে থাকে। জ্যৈষ্ঠে চলে প্রস্তুতি। আষাঢ়ে চাষিরা জলে পাট পচানোর সময় থেকে দুর্দিন শুরু হয়। নষ্ট জলে মাছ থাকে না। এখানে কৃষক এবং মৎস্যজীবীর পেশাগত একটি বৈপরীত্য ধরা পড়ে। আষাঢ়ে অম্বুবাচীর পর গঙ্গায় মাছ ধরতে চলে যায়। মহাজনের কাছে বাঁধা পড়া জিনিসের ওপর

অর্থমূল্য ধরে কিছু দিনের খোরাকি, কিছু নগদ টাকা এবং পরিবারের খাওয়া খরচ –সব মিলে নতুন ও পুরনো ঋণের প্রবাহ মাছমারার জীবনচক্র হয়ে দাঁড়ায়। আগেই অবশ্য একথা আমরা উল্লেখ করেছি।

মহাজনের কাছে যে বিষয়-বস্তু বাঁধা থাকে তা-ও তার মর্জি-মেজাজ অনুসারে কখনো কখনো একটা ন্যূনতম দাম ধরে বিক্রি হয়ে যায় অথবা ঋণের বরাবর হিসাব হয়ে তা মহাজনের সম্পত্তিতে পরিনত হয়। মহাজনের কারচুপিতে ঋণ সম্পূর্ণ শোধ হওয়া দুষ্কর। কায়ক্লেশে ঋণ যদিও শোধ হয় – প্রতিকূল প্রাকৃতিক কারণে দুটি খেয়ে বাঁচার জন্য মাছমারারা আবার ঋণ নিতে বাধ্য হয়। জাল, নৌকা, ঘরের অন্যান্য সম্পত্তি, ভিটা-বাড়ি শুধু নয়, ঘরের নারীদের মান-সম্মানও নষ্ট হয়। মহাজনী কারবারে- যে চালের বাজার দর ১২ টাকা মন, তার দাম ধরে ১৫ টাকা মন। সর্ষের তেল, কিছুটা মুসুরি, কিছুটা কলাই – এ সবেরও বাড়তি দাম ধরে এবং কিছু নগদ টাকার উপর সুদের প্রবাহ মাছমারাদের জীবনের দুষ্ট নিয়তি। যদি হঠাৎ প্রয়োজন হয়, তাই মাছমারারা হাতে কিছু নগদ টাকা সঙ্গে নেয়। মহাজনের কাছ থেকে যারা নগদ না পায়, তাদের ঘরের মূল্যবান জিনিস বাঁধা দিয়ে নগদ টাকা আনতে হয় (পুরোখোঁড়গাছির অনন্ত মালো- “ব্যাটার বউয়ের রূপোরবালা চুড়ি বাঁধা দে”[১] কিছু নগদ টাকা নিয়ে গেছে)। এই ধরনের মহাজনরা হয়তো আলাদা। গঙ্গায় মাছের আকাল হলে, গ্রামের মহাজনের দেওয়া খোরাকিতে না কুলালে – গঙ্গার পাড়ের ফড়ে-মহাজনের কাছে ঋণ নিতে হয়। আগেই আমরা এ বিষয় উল্লেখ করেছি। গ্রামের মহাজনের কাছে ঋণের বোঝা যেমন বাড়ে, গঙ্গার পাড়ের মহাজনের কাছেও ঋণের টাকা বাকী পড়ে। চন্দননগরের ফড়েনী, বুড়ি দামিনীর কাছে গত বছরের পঞ্চাশ টাকা ধার আছে পাঁচুর। তাই যা মাছ পায়, তা দামিনীকেই দিতে হয়। মহাজনকে না দিলে ধর্মত অপরাধ করা হয়। পাঁচুর দাদা নিবারণও দামিনীর কাছ থেকে ঋণ নিত। দামিনীর মায়ের কাছে ঋণ খেয়েছে পাঁচুর বাবা। সবটাই বংশ পরম্পরায় চলেছে। এ বছর থেকে দামিনীর নাতিনী হিমির সঙ্গে চলেছে এদের কারবার। পাঁচুর মৃত্যু হয়েছে, তাই আগামীতে পরবর্তী প্রজন্ম – ভাইপো বিলাস আর পাঁচুর ছেলে ঋণগ্রহণকারী হবে, মহাজন হিমি। জালে মাছ পড়ুক আর না পড়ুক, বেঁচে থাকতে গেলে পেটে খাদ্য পড়া চাই।

সমুদ্রে গেলেই যে ভাগ্য ফেরে তা নয়। পুরোখোঁড়গাছির অনন্ত গত বছর তিন ছেলেকে নিয়ে সুমদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। চার জনের খোরাকির পয়সাই মেলেনি। বিরূপ পরিস্থিতিতে সমুদ্রও শূণ্য হাতে ফিরিয়ে দেয়। এ বছর দুই ছেলেকে নিয়ে গঙ্গায় এসেছে। পুত্রবধূর গয়না বাঁধা রেখে কিছু নগদ টাকা এনেছে। পর পর তিন বছর গঙ্গায় উল্লেখযোগ্য মাছ পাওয়া যায়নি।

মাছমারারা যে মাছ পায়, তা তাদের বিক্রি করতেই হবে। মাছ নষ্ট হয়ে গেলে সমূহ ক্ষতি। ঘুরে ঘুরে দুয়ারে দুয়ারে বিক্রি করতে গেলে দাম কিছু বেশি পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে খরিদ্দার বিক্রেতার গরজ বুঝে দাম কম দেয়। তাতে লাভও হয়না, সময়ও নষ্ট হয়। সেই কারণে মহাজন, আড়তদার, ফড়ে-পাইকেরের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হয়। মাছ যদি খুব বেশি ধরা পড়ে, তাহলে মহাজনরাই দাম কমিয়ে দেয়। সমুদ্রের মহাজন ও গঙ্গার মহাজন এক্ষেত্রে সবাই সমান।

যখন ঘরের মানুষ নদী-সমুদ্রে রাত জেগে মাছ ধরে, তখন মাছমারার বৌ জেগে থেকে ঘরকন্না করে, স্বামীদের কল্যাণ কামনা করে। নদী-সমুদ্রে ঝড়-বাদলের ভয়ও কম কথা নয়। নিজে এবং ঘরে অন্যান্য যারা থাকে তারা নিজেদের জাল বোনা, সারানো ছাড়াও মহাজনের কাছ থেকে সুতো নিয়ে হাত-পিছু ফুরনে জাল বোনে। অন্নের হাহাকার প্রায় সারা বছরই থাকে। চুনুরী, নিকিরী, মালোর ঘরণী ও মেয়েরা অনাহারে থেকে, ছিন্ন পরিধানে থেকে, লজ্জা পরিত্যাগ করে হাঁটুজলে-কাঁদায় মাছ ধরে। দুর্বল শরীরে শুরু হয় পেত্নীর উপদ্রব। তান্ত্রিক-ওঝার আগমন ঘটে। চৈত্রের মন্বন্তরে অনেকেই চুরি করার পথ অবলম্বন করে। চুরির দায়ে ধরা পড়লে জেল-হাজত হয়। কেউ কেউ প্রহরীর হাতে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। অভয় মালো মাছ চুরি করতে গিয়ে রাতের অন্ধকারে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মারা গিয়েছিল। সব কাজেই ঝুঁকি আছে, সব বিকল্প ভালো নয়।

গঙ্গার পাড়ে মাঝে-মধ্যে দেখা যায়, পূর্ব অঞ্চলের কিছু মাছমারারা ভিটা-মাটি ছেড়ে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। সারা বছরের একটি নিশ্চিত আয়ের আশায় এসেছে তারা। আজন্ম পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে জীবিকার টানে ছিন্নমূল হয়ে কোথাও চলে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। পাঁচুর ভাবনায়, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 126
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"ভগবতীর কোলে পেয়ে গেছে ঠাঁই। যে পেয়েছে, পেয়েছে। যে পায়নি তাকে আসতে হবে সাত গাঙ ঠেলে।"[১০]

মালো সম্প্রদায়ের যারা মাছ ধরছে, তাদের সেই মাছ ফড়েদের কাছে অবশ্যই বিক্রি করতে হয়। ফড়ে বা আড়তদারের কাছ থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সেই মাছ কিনে নিয়ে বাজারে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদক বা সংগ্রাহক, পাইকারি ক্রেতা-বিক্রেতা, খুচরা ক্রেতা-বিক্রেতা, ভোক্তা অর্থ সংগ্রহ এবং অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি সংযোগ রক্ষা করে চলে। এই বিনিময় পদ্ধতি তথা বাজার অর্থনীতি, সদরে বা অন্দরে ভোক্তাকে এবং ব্যবসায়ীকে রক্ষা করে চলতেই হবে। আবার ভোক্তা ভোগ্যবস্তু আহরণের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে, সেই অর্থও তাকে বিবিধ উপায়ে সংগ্রহ করতে হয়। কাঠ, চুন, শুরকির গোলায় ভিন রাজ্যের কুলি-কামিনরা মজুর খাটতে আসে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। মড়া এলে শ্মশানঘাটে সাধুবাবা খেতে পায়।

চন্দননগরের ফড়েনী দামিনী – মহাজনী করে। বয়সকালে স্বাধীন জীবন যাপন করেছে। তার মেয়ে বিধবা হবার পর দেহব্যবসা করেছে। তার নাতিনী হিমি এক বছর চুঁচুড়ার এক বড়লোকের সাথে সহবাস করে চলে এসেছে। সেই বাবুর মোটর বাস, লরির ব্যবসা। হিমি আর টাকার বিনিময়ে কারো রক্ষিতা হয়ে থাকতে চায় না। মায়ের সঞ্চিত অর্থে, দিদিমার মহাজনী ও মাছের ব্যবসায় করে জীবন কাটাতে চায়। দামিনী, বিলাসের বাবা নিবারণকে আশ্রয় করে সাগরের ফড়েনী হতে চেয়েছিল। হিমিও বিলাসকে অবলম্বন করে সাগরের মহাজনী করার বাসনা ব্যক্ত করেছিল। দামিনীর কয়েক ঘর ভাড়াটে আছে। এদের পাড়াটা খারাপ পাড়া বলে পরিচিত। সমুদ্রে ধরা মাছ যেসব আড়তে বিক্রি হয়, সেখানেও খারাপ পাড়া থাকে।

দামিনীর প্রতিবেশিনী আতরবালা মাছের কারবার করে। মাছ বিক্রি করে বাজারে, দেহ বিক্রি করে ঘরে। প্রথম যৌবনে দেহটাই মূলধন ছিল। দুলাল আতরবালার কাজ করে, খায়, ঘরে থাকে। দুলালের জীবন আছে, জীবিকা নেই। পশ্চিম পারের রসিক জাতে মাছমারা। সে মাছ মারে, দালালীও করে। আতরবালার জন্য বাবু ধরে আনে। অন্য সব মাছমারাদের মত গঙ্গার পাড়ের বড় মহাজন ব্রজেন ঠাকুরের কাছে সে ঋণগ্রস্ত। তার বৌ ব্রজেন ঠাকুরের কাছে থাকে। দামিনীদের পাড়ায় দু-চার ঘর মাছমারা আছে। তারা খুবই গরিব, পরের নৌকায় কাজ করে। মেয়েরা মিল-কারখানায় কাজ করে।

হিমি একবার ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। লেখক অবশ্য হিমির বিলাসের সঙ্গে প্রেমঘটিত মানসিক চাঞ্চল্যের বিষয়টি পাঠকের দরবারে তুলে ধরেছেন।

বিলাস দামিনীর কাছে পুরনো দেনার উপর আরো ধার করে তার কাকার শেষবারের মতো চিকিৎসার জন্য বদ্যি ডাকতে চেয়েছিল। গ্রাম্য ধারণায় বিলাস কবিরাজের কথা বলতে পারে। অথবা, বদ্যি অর্থে বিলাস ডাক্তারের কথাই বলেছে ধরে নেওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়।

যে মহাজনী নৌকা কেদমে পাঁচুর খুঁটে জাল ছিঁড়ে দিয়েছিল, সেই নৌকায় হয়তো বে-আইনি মাল চালান যাচ্ছিল। উপন্যাসে এমন আভাস আছে; পুলিশের উল্লেখ আছে। সুন্দরবনে এক শ্রেণীর লোক কাঠ চুরি করে।
গঙ্গার তীরে যারা বাস করে, সেই মাছমারারা সুবিধামতো গঙ্গায় জোয়ার-ভাটায় জাল ফেলতে পারে। পুবের মাছমারারা বেশি জাল আনতে পারে না; নৌকায়ই রাঁধাবাড়া-বসবাস। তাই নৌকায় স্থানাভাব। স্থায়ী বাসিন্দারা শুধু মাছ ধরার সরঞ্জামই নয়, ঘরের লোকেদের সাহায্যও পায়।

গঙ্গায় এবং সাগরে বেশি মাছ ধরা পড়লে, মহাজনেরা কারসাজি করে মাছের দাম কমিয়ে দেয়। জেলেরা তিরিশ টাকার মাছ পাঁচ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হয়। লেখকের কলমে মাছমারার জীবনসত্য যেভাবে ধরা পড়েছে, তা হল, -

"মাছমারার মাছ পেলে জ্বালা, না পেলেও জ্বালা। দেখা যায় যেন এইটিও তার জীবনেরই বিধান।"[১১]

শ্রাবণ মাসে গঙ্গায় মাছমারাদের মন্বন্তর নেমেছে (উপন্যসে যা বর্ণিত)। ক্রমাগত জলে ভিজে, রোদে পুড়ে জেলেরা মাছ ধরার চেষ্টা করে। আধপেটা খাওয়া এবং রোদবৃষ্টিতে ভিজেপুড়ে আমশয় রোগ জেলেদের মধ্যে মারীর আকার ধারণ করে। বৃদ্ধ পাঁচু মারা যায়। বন্যায় অনেক মানুষের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। স্থানীয় বাচ্চারা-বুড়োরা শহরের রাস্তায় ভিক্ষা করা শুরু করেছে। বানভাসি মানুষরাও বাঁচার উপায় খুঁজতে আসছে। স্থানীয়রা কিছু সরকারী সাহায্য পেলেও মাছমারাদের

মহাজনই ভরসা। উপর্যুপরি মাছমারাদের দেনা বাড়তে থাকে। মাছের সন্ধান যখন মিলছে না, তখন ঠাণ্ডারাম বলেছে যে, এ অবস্থার কথা আগে জানলে সে এবার ক্ষেতমজুরি করতো। সে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেয় (ঠাণ্ডারামের অবশ্য বাড়ি ফেরা হয়নি। বাড়ি ফেরার আগেই সে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছে)। বাড়ি ফিরে সে যা করতে চেয়েছিল,-

> "হাসনাবাদ না হয় কালীনগরে গে হাটের দিনে লৌকায় মাল টানলেও কিছু রোজগার হবে।"[১২]

পাঁচুর অভিজ্ঞতায় আছে, বহু মাছমারা তাদের নিজেদের বৃত্তি ছেড়ে, সব বেঁচে ফেলে বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে দূর বাদাবনে চলে গিয়েছে; ভিন্নতর ভাগ্যান্বেষণে। অল্প বয়সে বিলাসের শহর দেখার খুব শখ ছিল। তাদের গ্রামের ও আশেপাশের চাষিদের কাছে যেসব ফড়েরা মাল-জিনিস আনতে যায়, তাদের সাথে দুবার সে পালিয়ে কলকাতা শহর দেখতে এসেছিল। অবস্থার বিপাকে যে পাঁচু জমিজমা করার বাঁধা সুখের স্বপ্ন দেখেছিল, অন্তিমকালে বিলাসকে বংশপরম্পরায় তাদের মাছমারার বৃত্তিই অবলম্বনের জন্য আশীর্বাদ করে গিয়েছে। অবশেষে সব অপেক্ষার অবসান ঘটে ভাদ্র মাসে। গঙ্গায় সুদিনের সুফল প্রাপ্তিযোগে বিলাসের দামিনী-হিমির দেনা শোধ হয়েছে। সে গাঁয়ের মহাজন পালমশায়ের দু'শো টাকা দেনা শোধ করেছে। উপরন্তু মাছ বিক্রি করে সে আড়াইশো টাকা আয় করেছে। হিমিকে নিয়ে দেশে (নিজের গ্রামে) ফেরার আগে বিলাস দামিনীকে আশ্বাস দিয়েছে যে, হিমিকে সে মাছেভাতে রাখবে। কিন্তু জাল মেরামত করতে করতে বিলাস মনে মনে যে কথা ভাবেছে, তা তার বাইশ বছরের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সার্থক প্রতিফলন, -

> "মাছমারার বউ আর কবে সুখের ভাত খেয়েছে। সুখের নয়, স্বস্তির ভাত মাছমারার বউ খায় না। প্রাণে তার সুখটুকু সার। উপোসের দুঃখ পেতে হয়। কেননা, নদী আর সমুদ্রের মর্জির উপর বাঁচে মরে মাছমারা।"[১৩]

হিমি বিলাসের সঙ্গে জীবনসঙ্গিনীরূপে রওয়ানা হয়েও শেষ পর্যন্ত যেতে পারেনি। কেনো? এই প্রশ্নের বহু বিতর্কিত উত্তর ভেবে নেওয়া যেতে পারে। আমরা একটির উল্লেখ করছি মাত্র - হয়তো অনিশ্চিত জীবিকা। পরস্পরের প্রতি প্রবল ভালোবাসার টান থাকা সত্ত্বেও জীবনে তারা দুই ভিন্ন পথের পথিক। জীবনজিজ্ঞাসার মর্মবিদারী উত্তর, প্রেমের মোহনায় এসে তাদের উপলব্ধি হয়েছে। কিন্তু বিলাস বাঁধা সুখের ঠিকানা সন্ধান করতে সাগরে যাবেই। জীবনগঙ্গার জোয়ার-ভাটার কূলে বিলাসের আসার অপেক্ষায় হিমি থাকতে চায়। জন্ম-মৃত্যুর গঙ্গাসাগরে কত বিচিত্র জীবন ও জীবিকার সন্ধানে মানুষ ধাবমান। সকল জীবিকা অবলম্বনের ক্ষেত্রে জীবনের একটি চলমানতার সূত্র-সন্ধান অতি গোপনে চিরকাল অব্যাহত।

Reference:

১. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ১৪-১৫
২. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ১৭
৩. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ২২
৪. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ২৬
৫. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ২৬
৬. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ৩২
৭. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ৩১
৮. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ৩১
৯. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ৫২
১০. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ৫৩
১১. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ১৩০
১২. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ১৪৭
১৩. বসু, সমরেশ, 'গঙ্গা', মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ১৭৪

Bibliography:

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০০-২০০১

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ১৯৮০

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬

মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, 'গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ২৮শে মে, ২০০৫